ধরণির পথে পথে

মুসাফির চোখে দিক-দিগন্তের জীবন দর্শন

জিয়াউল হক

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

সবাই বলে– পৃথিবী একটা গ্রহ। সেই গ্রহটাই মনুষ্য জাতির গৃহ। হাসি, কান্না, মায়ার এক পৃথিবী। কত কী ঘটে যাচ্ছে! ক'টার খোঁজ জানি। গ্রহটা মুহূর্তেই রং বদলায়। কোটি কোটি বনি আদম নানান রঙে জীবনকে দেখছে। প্রত্যেকেরই জীবনকে দেখার একটা নিজস্ব আয়না আছে, ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আছে।

হাসপাতালের বেডে নবজাতকের জন্মের মিষ্টি খেয়ে একটু খোশমেজাজে আছেন, তো আপনার সামনে দিয়ে আইসিইউ থেকে বের হওয়া লাশের ট্রলি দেখছেন। আপনি যেখানে বেদনার নীল দেখছেন, আমি সেখানে স্বপ্নের ফানুস দেখি। আপনি যেখানে আলোর মিছিল দেখেন, আমি সেখানে নিকষ কালো অন্ধকার দেখি। এই যে ভিন্ন ভিন্ন দেখা, তার পেছনের ঘটনা কিন্তু একই! কী অদ্ভুত! তাই না? একই ঘটনার বহুবিধ দর্শন, ব্যাখ্যা, ভাবনা।

লেখক জিয়াউল হক তার চোখে দেখা এমন কিছু ঘটনাকে পাঠকদের সামনে এনেছেন, যা পড়ে পাঠক শিহরিত হবেন। কখনো চোখ ভিজে যাবে, বিস্ময় জাগবে কখনো। অনেক দুর্বোধ্য এক জগতের মুখোমুখি হবেন।

ধরণির পথে পথে ঘটে যাওয়া এই দৃশ্যপটকে আমরা মলাটবদ্ধ করতে পেরে উচ্ছ্বসিত ও শিহরিত। এই গ্রন্থের সবগুলো লেখাই *দৈনিক যায় যায় দিন*-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। তুমুল জনপ্রিয় এই ধারাবাহিক গ্রন্থাকারে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারা বড়ো তৃপ্তির। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সম্মানিত লেখককে উত্তম প্রতিদান দিন।

সকলের জীবন সুন্দর হোক, সফল হোক।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
৩ নভেম্বর, ২০১৯

আমার দুটি কথা

একদিন সাহস করে কলম চালানো শুরু করেছিলাম; সাহিত্য দুনিয়ায় পরিভ্রমণ করব তাই। ঠিক কবে, কখন– তা আজ আর মনে নেই। শুধু এটুকু মনে আছে, পাকিস্তানের করাচি শহরে 'পিএনএস শেফা' নেভি কলোনির স্কুলে আমার দুজন প্রিয় শিক্ষক ছিলেন; আব্দুল কাদের আর আব্দুস সবুর স্যার। সেখানেই একবার দেয়াল পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। আব্দুল কাদের স্যার বললেন– 'জিয়া, একটা লেখা দাও।' আমি তখন সবেমাত্র ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। কবিতার মতো কি একটা লিখে দিয়েছিলাম স্যারের হাতে। ওমা! স্যার দেয়াল পত্রিকায় সেটি প্রকাশও করে দিয়েছিলেন! সেদিনকার সেই বালক জিয়া আনন্দে সারা রাত আর ঘুমাতে পারেনি। সেই আনন্দই যেন কালক্রমে এক সংক্রামক ব্যাধিতে পরিণত হলো; রাত জেগে জেগে পড়ার বদভ্যাসের সাথে শুরু হলো যা মনে আসে তা-ই লিখে ফেলা।

শুরুটা এভাবেই। আজও সেই বদঅভ্যাস ছাড়তে পারিনি। কিছু একটা লেখার জন্য হাতটা যেন নিশিপিশ করতেই থাকে। আর তারই ফলে এই অজ্ঞ, মূর্খ আমিই লিখে ফেললাম বেশ কিছু ফিচার, আর্টিকেল! দুই ডজন বইও!

আশকারা দিলে নাকি মানুষের সাহস বেড়ে যায়। সম্পাদক আর পাঠকের আশকারা পেয়ে আমারও তেমন দশা। লেখা পাঠিয়ে দিলাম তৎকালীন পাঠকপ্রিয় সাপ্তাহিক *যায়যায় দিন*-এ। শ্রদ্ধেয় শফিক রেহমান তখন এই সাপ্তাহিকের সম্পাদক। শফিক ভাই আশকারা দিয়ে বেশ কয়েকটি লেখা প্রকাশ করে ফেললেন। *যায়যায় দিন*-এর লেখা পড়ে বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে পাঠকবৃন্দ ই-মেইল, চিঠি ও টেলিফোনে তাদের প্রতিক্রিয়া জানান। কেমন এক দুর্বোধ্য কারণে আমার এই ভাঙা কলমের লেখাগুলো কিছুটা হলেও পাঠকপ্রিয় হয়ে ওঠে। সম্পাদক সাহেব তা দেখে আরও কিছু লেখা দেওয়ার অনুরোধ করলেন। তাঁরই পরিকল্পনা ও আগ্রহে শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর সাপ্তাহিক *যায়যায় দিন*-এ আমার লেখাগুলো নিয়ে 'ধরণির পথে পথে' নামে একটি কলামই চালু করে ফেললেন।

কয়েকটি লেখা প্রকাশের পর থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকেও অনেক পাঠক-পাঠিকাই অনুরোধ করেছেন– এসব লেখাগুলো যেন গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করি। অবশেষে শ্রদ্ধেয় পাঠকেরই জয় হলো!

এই গ্রন্থে স্থান পাওয়া লেখাগুলোর সবকটিই সত্য এবং বাস্তব জীবন থেকে নেওয়া হয়েছে। মোট তিনটি ঘটনা ছাড়া আর সব ক'টি ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর নাম, ঠিকানা ও পরিচিতি পরিবর্তন করা হয়েছে অথবা গোপন করা হয়েছে। আমার দেখা বা জানা ঘটনাগুলোকেই পাঠকের কাছে তুলে ধরেছি, তবে বর্ণনার প্রয়োজনে আবেগ আর অলংকরণের আশ্রয় নিতে হয়েছে।

চেষ্টা করেছি এমনভাবে বর্ণনা করে যেতে, যেন পাঠক বুঝে উঠতে পারেন– কোনটি আমার আবেগ ও দৃষ্টিভঙ্গি আর কোনটি বাস্তব ঘটনা।

কোনো কোনো লেখায় আমার কতক বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীর নাম এসেছে। এ ক্ষেত্রে তাদের নামধাম পরিবর্তন করিনি। কারণ, তাদের মতো গুণীজনের সাহচর্য পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে– তা গোপন করতে চাইনি।

বইটি প্রথম প্রকাশের পর মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই সব কপি বিক্রি হয়ে যায়। দীর্ঘদিন ধরে তা আর বাজারে নেই। দেশে এবং দেশের বাইরে থেকে বহু পাঠক বিভিন্ন সময় বইটির খোঁজ নিয়েছেন, কবে প্রকাশ হচ্ছে জানতে চেয়েছেন, তাদের সে ইচ্ছা আর অপেক্ষার অবসান ঘটাতে প্রকাশনার জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান *গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স* এগিয়ে এসেছে। সে জন্য গার্ডিয়ানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নূর মোহাম্মাদ আবু তাহেরসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর একটা গোষ্ঠী যাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার কথা প্রকাশ না করলে গুরুতর অপরাধ হবে, তারা হলেন সারা বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা সুবিশাল পাঠকগোষ্ঠী– যারা আমাকে নিত্যই প্রেরণা, সাহস আর উৎসাহ দিয়ে চলেছেন, তাদের সকলের কাছেই এক অপরিসীম ঋণে আটকে রইলাম।

জিয়াউল হক
ইংল্যান্ড
জানুয়ারি ২০১৯

যাদের হাতে তুলে দিলাম

কুষ্টিয়া দৌলতপুর থানাধীন ফিলিপনগর উচ্চ বিদ্যালয়েই স্কুল জীবনের শেষ দুটি বছর কেটেছে। প্রধান শিক্ষক মরহুম আফতাব উদ্দীন আহমেদ–এর কঠোর অনুশাসন আর সকল শিক্ষকদের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমাদের মতো অঘা মার্কা ছাত্রদের জীবনে এক দারুণ এবং কার্যকর প্রভাব ফেলে রেখেছে সারাটি জীবনের জন্য। শ্রদ্ধেয় সেই সব শিক্ষক, জনাব মুহাম্মাদ শাহজাহান, মোজাম্মেল হক, তোফাজ্জল হোসেন, আবু তাহের, নূর মুহাম্মাদ, আমানুল্লাহ এবং এলাহি বক্সসহ উক্ত স্কুলের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের হাতে তুলে দিলাম গ্রন্থখানা।

সূচিপত্র

সিক্স সেভেনটি ফাইভ, ওয়েলবেক রোড	১৩
কালের নির্মমতার সাক্ষী	২২
ন্যান্সি ও লায়লার সঙ্গে এক প্রহর	২৮
খোকন সোনা বলি শোনো...	৩৭
একজন মুহাম্মাদ তাওফিক	৪৫
ট্রেসি	৫৪
সখি ভালোবাসা কারে কয়...	৫৯
এক এডওয়ার্ড হজকিন ও তার ভালোবাসা	৬৮
সে আমার ছোটো বোন, বড়ো আদরের	৭৯
আমার ও মায়ের মূল্য কত	৮৭
আমি যে মা, আমার কি রাগ করে...	৯৩
একজন জাদ আল রাব	১০১
একা, বড়ো একা	১০৭
মাইন্ড ইউর বিজনেস!	১১৩
তোমারে করি নমস্কার	১১৯
হাসি-কান্নার কথকতা	১২৭
টাইম : দ্যা অ্যাভেঞ্জার	১৩৩
খেলা ভাঙার খেলা	১৩৯
দুবছর দশ মাস দশ দিন!	১৪৫
তুমি কি দেখেছ কভু জীবনের পরাজয়	১৫১
ছবি যেন শুধু ছবি নয়	১৫৭
শোনো বাহে, জাতিসংঘ তারেই কহে	১৬৩
সালামত্বাক ইয়া আবু সালাহ	১৬৯
ব্যাটা গেল কই	১৭৬
ভালোবাসার হার-জিত	১৮২
নো দাইসেলফ	১৮৯
গুড লাক পলিন	১৯৬
এই দায় আমার, কেবলই আমার	২০৩

সিক্স সেভেনটি ফাইভ, ওয়েলবেক রোড

টানা চব্বিশ ঘণ্টা বিমানযাত্রা শেষে পৌঁছলাম ইংল্যান্ডের নিউক্যাসল শহরে। আগের দিন কুয়েত থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম ঠিক দুপুরের দিকে। আজকাল তো এয়ারপোর্টে নিরাপত্তার জন্য চেকিংয়ের মধ্যেই চলে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বিকেলের দিকে কুয়েত থেকে রওয়ানা হয়ে মাত্র এক ঘণ্টা পনেরো মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম দুবাই। এখানে বসতে হবে প্রায় চার ঘণ্টা। বিষয়টা যেহেতু আগে থেকেই জানতাম, তাই আসার সময় হাতে করে একটা বই নিয়ে এসেছিলাম। আর বিরতির সময়টাও বই পড়েই পার করে দিলাম।

লন্ডনে পৌঁছেও একই দশা! অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট ধরার জন্য আবারও কয়েক ঘণ্টা বসে থাকতে হলো। কী আর করার? বাধ্য হয়েই একটি পত্রিকাকে সঙ্গী বানিয়ে অপেক্ষার সময়টা কাটালাম। নিউক্যাসলের এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেখি, আমার নাম লেখা প্লাকার্ড হাতে এক ব্রিটিশ তরুণী দাঁড়িয়ে! পরিচয় দিতেই তিনি আমাকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। আর আগে থেকেই প্রস্তুত গাড়িতে উঠিয়ে সরাসরি আমার নিয়োগকর্তার সঙ্গে দেখা করার জন্য হাসপাতালে নিয়ে এলেন।

খুব আন্তরিকতার সঙ্গেই তিনি রিসিভ করলেন এবং প্রাথমিক আলাপচারিতার ফাঁকে চা দিয়ে আপ্যায়ন করতে করতে বললেন, 'তোমার জন্য দুই রুমের একটা ফ্ল্যাট ঠিক করা আছে। ভেতরে বিছানাপত্রও সব গোছগাছ। আজ তাহলে বিশ্রাম নাও, আগামীকাল আবার দেখা হবে।'

বিদায়ের সময় তিনিও আমার সাথে নিচের গেট পর্যন্ত এসে গাড়ির ড্রাইভারের হাতে একটি চাবি তুলে দিয়ে বললেন– 'ওকে ৬৭৫, ওয়েলবেক রোডে নিয়ে যাও। ফ্ল্যাটের ভেতরে পৌঁছে দিয়ে তারপর ফিরবে।'

ড্রাইভার আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলল। মাত্র পাঁচ মিনিটের মাথায় একটি বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে নামতে বলল। ড্রাইভার আমার বড়ো লাগেজটা নিয়ে একটি বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দরজা খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি ব্রিফকেসটা হাতে নিয়ে তাকে অনুসরণ করলাম মাত্র।

পাশের দরজায় মাত্র হাত দুয়েকের মধ্যে একজন বৃদ্ধা মহিলা, বয়স আনুমানিক পঁয়ষট্টি হবে, দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছেন। আর তার পায়ের কাছে চার-পাঁচ বছর বয়সের একটি ফুটফুটে শিশু খেলা করছে। দুজন অপরিচিত লোককে তাদের পাশের ফ্ল্যাটের দরজা খুলতে দেখে শিশুটি খেলা ছেড়ে আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে গভীর কৌতূহল নিয়ে দেখছে। হাত দিয়ে আমার পায়ের কাছে রাখা লাল রঙের বড়ো লাগেজটাও নেড়েচেড়ে দেখতে শুরু করেছে, কিন্তু ততক্ষণে ড্রাইভার দরজা খুলে লাগেজটা নিয়ে ভেতরে ঢুকতে শুরু করেছে। দরজা খুলেছে দেখে আমিও তাকে অনুসরণ করলাম। ততক্ষণে বাচ্চাটা আমার হাঁটুর পেছন দিকে আলতো করে একটা গুঁতো দিয়ে বসল। আমি তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বাসায় ঢুকে পড়লাম।

লাগেজ খুলব আর রুমটা যে গোছগাছ করব, সে শক্তি আপাতত নেই। খুব ক্লান্তি বোধ করছিলাম এবং একই সঙ্গে প্রচণ্ড ক্ষুধাও। বাসায় আবার রান্নাবান্না করারও কিছু নেই; অবশ্য সে সুযোগও নেই। তা ছাড়া এই মুহূর্তে কিছু রান্না করে খাওয়ার ইচ্ছেও নেই। তাই ড্রাইভারকে অনুরোধ করে বললাম, আশেপাশে কোনো খাবারের দোকান থাকলে একটু দেখিয়ে দাও।

তার সাথেই বেরিয়ে এলাম। সে একটি দোকান দেখিয়ে দিলো। রাস্তার ওপাশেই একটি গ্রোসারি। আসার সময় তা একেবারেই খেয়াল করিনি। সেখান থেকে পাউরুটি, জেলি আর এক বোতল দুধ কিনে ঘরে ফেরার জন্য মুখ ঘুরিয়েছি, এমন সময় দোকানের দরজা থেকেই চোখে পড়ল বাসার সামনে সেই বাচ্চাটা তখনও খেলছে। কী মনে করে দোকান থেকে একটি ক্যান্ডিবার তুলে নিলাম, দাম পরিশোধ করে বাসার দিকে পা বাড়ালাম।

বাসার দরজায় চাবি হাতে দাঁড়িয়েছি, তখনও দেখি সেই ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে আছেন; সম্ভবত বিকালের রোদ উপভোগ করছেন। তার দিকে ক্যান্ডিবারসহ হাত বাড়িয়ে বললাম– 'ম্যাডাম, বাচ্চাকে এটা দিলে তুমি কি কিছু মনে করবে?'

ভদ্রমহিলা আমার কথার জবাব দেওয়ার সময়ই পেলেন না, তার আগেই বাচ্চাটা ক্যান্ডিবারের দিকে তার কচি হাত বাড়িয়ে দিলো। ভদ্রমহিলাই আমার হাত থেকে বার নিলেন এবং তার দিকে এগিয়ে দিলেন। আর ও সেটা নিয়ে চলে গেল। যাওয়ার আগে আমার দিকে আরেকবার তাকাল, তার মুখে প্রাপ্তির হাসি। 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে এক দৌড়ে চোখের আড়াল হয়ে গেল।

ভাবখানা এমন– কেউ যদি আবার ভাগ চেয়ে বসে, তাই আগেভাগে সরে পড়াই ভালো।

রাতে খেয়েদেয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হলো। ইংল্যান্ড সময় রাত নয়টা, কিন্তু সূর্য যে ডোবে না! এখনও পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করে রেখেছে। মাগরিবের নামাজ হবে রাত পৌনে দশটায়। আর ইশা রাত এগারোটায়! তাই বসে বসে অপেক্ষা আর ঝিমানো ছাড়া আপাতত আর কিছু করার নেই! এভাবেই কোনোমতে রাত এগারোটায় ইশার নামাজ আদায় করে ঘুমিয়ে পড়লাম।

রাত আড়াইটায় ফজরের নামাজ। সে সময় পেরিয়ে গেছে ঘুমের মধ্যেই। ঘুম ভাঙল অনেক বেলা করে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে নয়; ধুমধাম শব্দে। ঘোর কাটতেই বুঝলাম, ওপরতলায় বাচ্চাটা মনে হয় খেলাধুলা করছে।

তারপর ফ্রেশ হয়ে নিত্যদিনের মতোই নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। অচেনা, নতুন জায়গায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সময় লেগে গেল প্রায় দুই সপ্তাহ। এর মধ্যে অফিসে আসা-যাওয়ার পথেই কখনো কখনো 'হাই, হ্যালো' হয়েছে ওপরতলার সেই ভদ্রমহিলার সঙ্গে।

পরে পরিচিত হওয়ার সময় জানলাম তার নাম জিলিয়ান। পঁয়ষট্টি বছর বয়সের এক বিধবা। বছর পাঁচেক আগে মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালাতে গিয়ে এক মোটর দুর্ঘটনায় স্বামী মারা যান। দুই ছেলে– একজন আজ প্রায় একুশ বছর ধরে গার্লফ্রেন্ড নিয়ে বাস করছে নিউজিল্যান্ডে। আর অন্যজন, সে-ও প্রায় আট বছর ধরে বাস করছে গ্রিসে। বলা যায়, সেখানেই থিতু হয়ে গেছে। বাবার মৃত্যুর খবর শুনে একবার এসেছিল, কিন্তু বড়োটা তো তা-ও আসেনি। নিজের বাবার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে একটি কার্ড পাঠিয়েছিল কেবল, এটুকুই!

আর একটি মাত্র মেয়ে। মেয়েটি কাছেই ছিল, কিন্তু দারুণ চঞ্চল আর উশৃঙ্খল। তার জ্বালায় জিলিয়ান প্রায় সব সময় অস্থির থাকতেন। সেই স্কুলমুখী হওয়া বয়স থেকেই সব সময় সে কোনো না কোনো ঝামেলা বাধিয়ে রাখত। বাবার মতোই অতিরিক্ত পানাভ্যাস ছিল তারও। প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে বন্ধু ও বান্ধবীদের সঙ্গে চলে যাবে শহরের কোনো পানশালা বা নাইটক্লাবে। আর ফিরবে সেই ভোরে কিংবা সকালে। আবার কখনো কখনো তো দু-চার দিন কোনো খবরই থাকে না। হয়তো বন্ধু ও বান্ধবীরা মিলে কোথাও ঘুরতে চলে যায়। যাক সমস্যা নেই, কিন্তু একটু বলে তো যাবে? না, তা যাবে না!

তখন জিলিয়ানকে কাটাতে হতো এক নিদারুণ দুশ্চিন্তার মধ্যে। সে হিসেবে এখন তিনি অনেক আরামেই আছেন বলা যায়। কারণ, তার মেয়ে হলিডে কাটাতে গিয়েছিল স্পেনে। সেখানে হঠাৎ করেই পরিচয় হয় এক স্প্যানিশ যুবকের সঙ্গে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত তার সাথেই আছে। ফোন করে জানিয়েছিল, সে তার পছন্দের মানুষটিকে পেয়েছে! আর স্পেনও খুবই চমৎকার দেশ। তাই সে আর ফিরছে না। আর মাকে অনুরোধ করে বলেছিল, মা যেন তার সন্তান উইলিয়ামকে দেখে রাখেন।

উইলিয়ামকেই তিনি আদর করে বিল নামে ডাকেন। ফুটফুটে কিন্তু দুরন্ত এই বাচ্চাটিকে দেখলেই খুব মায়া হয়। ওর নানির ভাষায়– 'একবারে মায়ের মতো হয়েছে। এক মুহূর্তও চুপ করে বসে থাকতে পারে না। জ্বালিয়ে মারল আমাকে। বুঝলে বাছা! যতক্ষণ সে স্কুলে থাকে, আমি একটু শান্তিতে থাকি। আর যে-ই না সে স্কুল থেকে এলো, অমনি শুরু হলো অশান্তি!'

একদিন তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম বিলের বাবার কথা। বৃদ্ধা আমার দিকে অবাকচোখে তাকালেন! যেন প্রশ্নটি করে বোকামি করে ফেলেছি। তারপর তিনি বলে উঠলেন, 'ওর বাবার পরিচয়ই যদি জানতাম বাছা, তাহলে কী আর আমাকে এই দুর্গতি পোহাতে হতো! কবে তাকে ঘাড় ধরে এনে এই বজ্জাতটাকে তার হাতে তুলে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতাম। কত করে মেয়েকে প্রশ্ন করেছি, ওর বাবা কে? কিন্তু আমার মনে হয় সে নিজেই জানে না। আমাকে জানাবে কি!'

আমি বিস্ময়ে হতবাক! আমার সারা শরীর যেন ঘৃণায় ঘিনঘিন করে উঠল। আমরা যাদের উন্নত বলে জানি, তাদের সমাজেরই এই করুণ দশা! পতনের সীমা ছাড়িয়ে আজ তারা অধঃপতনের কোন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, তাদেরই জানা নেই। নিজেকে বিশ্বাস করাতে না পারলেও এটাই চরম বাস্তবতা যে, জন্মদাত্রী মা পর্যন্ত জানে না তার সন্তানের জন্মদাতা কে? সে কথা না হয় রাখলাম আপাতত; এখন কথা হচ্ছে– সেই মা-ই বা কেমন মা, যে দেড়-দুই বছরের শিশুকে ফেলে স্পেন চলে যায়! এই ছোট্ট নিষ্পাপ বাচ্চাটা জানে না তার বাবা কে? কে তার জন্মদাতা? এই ব্রিটেনে প্রতি বছর পিতৃপরিচয়হীন এমন হাজারো সন্তান জন্ম নেয়; বিল তাদেরই একজন।

আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল কদিন আগের একটা ঘটনা। বড়োদিনের মাত্র কয়েকদিন আগে এক অলস-দুপুরে বাসায় বসে ল্যাপটপে কাজ করছিলাম। এমন সময় দরজায় ধুমধাম শব্দ শুনেই বুঝলাম, বিল এসেছে। উঠে দরজা খুলে দিতেই সে ঘরে ঢুকল। ওর হাতে একটি গ্রিটিংস কার্ড। কার্ডটি আমাকে দেখাচ্ছে আর বলছে– 'জিয়া, এই দেখ মা আমার জন্য পাঠিয়েছে!' তার সে-কী আনন্দ! চোখে-মুখে উচ্ছ্বাস!!

জিলিয়ান হাঁটুর ব্যথায় আজকাল ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। তার একাকিত্ব আর অসহায়ত্ব দেখে আমারও বড্ড মায়া হতো, কিন্তু আমার কিই-বা করার আছে। তাই মায়ের বয়সি জিলিয়ানকে একটু শান্তিতে সময় কাটানোর জন্য মাঝেমধ্যে আমি বিলকে কাছে রেখে গল্প বলা বা খেলায় মাতিয়ে রাখতাম।

আহা, এক অসহায় আর নিঃসঙ্গ মা! একটুখানি সময় শান্তিতে থাকুক। আমার সাহায্যে বৃদ্ধাও বেশ খুশি থাকেন। বিল আমার কাছে বসে গল্প শুনত, নিজেও বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলত। আমার বিছানায় লুটোপুটি খেত। ল্যাপটপের স্ক্রিনে ভেসে থাকা সমুদ্রের তলদেশের ভাসমান মাছ আর শৈবালের ছবিগুলোর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত।

মন খারাপ হলে আমরা প্রবাসীরা অনেক সময় বাবা-মা ও আত্মীয়স্বজনের ছবি নিয়ে স্মৃতি রোমন্থন করি। আমার ধারণা, প্রায় সকল প্রবাসীই তা করে থাকেন। একদিন আমার টেবিলের ওপরে রাখা অ্যালবামটি বিলের হাতে পড়ে যায়। সেদিন সকালে ছবিগুলো দেখে আলমারিতে উঠিয়ে রাখতে ভুলে গেছি। তাই তা বিলের চোখে পড়ে যায়।

পরের অবস্থা হলো মুশকিল– একের পর এক সে প্রশ্ন করেই চলেছে, ইনি কে? এটা কার ছবি? ওটা কার ছবি? পরিবারের সবার সঙ্গে আমার মরহুম বাবার বড়ো একটি সাদাকালো ছবি আছে।

তা বহুদিন আগে তোলা; পাকিস্তানের করাচি শহরে। সেটাতে আমার ছোটোকালের ছবি দেখিয়ে দিলে, তা দেখে বিল হাসতে হাসতে শেষ। আমি নাকি দেখতে বিখ্যাত কার্টুন ছবি *মিকি মাউজ*-এর মিকির মতো ছিলাম। সে এসব বলে আমাকে খ্যাপিয়ে নিজে নিজে বেশ মজা করতে লাগল। হঠাৎ আমার বাবার সাদাকালো সেই ছবিতে আঙুল দিয়ে ও প্রশ্ন করে বসল, 'হু ইজ হি?'

বললাম, 'আমার বাবা।'

বিল ছবিটি ভালো করে দেখল। অনেকক্ষণ ধরেই দেখল। কিছুক্ষণ সে আর কোনো প্রশ্ন করল না। একেবারে সুবোধ বালকের মতো চুপচাপ। হঠাৎ করেই যেন তার ছবি দেখার উৎসাহ উবে গেছে। এরপরে আচমকা আমার মুখের দিকে মুখ উঁচিয়ে প্রশ্ন করে বসল– 'জিয়া, তুমি কি জানো আমার বাবা কোথায়?'

বিরাট একটা ধাক্কা খেলাম! বিল আমার কোল ঘেঁষে দাঁড়াল, আমার একটি আঙুল নিয়ে খেলা করতে করতে মুখ নামিয়ে খুব নরম গলায় বলল– 'জানো, টমের বাবা রোজ স্কুলে ওর সাথে আসে, আবার ওকে নিয়েও যায়। জানো জিয়া, আমার বাবা আমাকে নিতে একদিনও আসে না!'

তার এই কথা শুনে বুকের ভেতরটা যেন ফেটে যাওয়ার উপক্রম হলো। আহা! কী কচি মুখ, কী বিষণ্নতা-ভরা অনুযোগ! উঠে দাঁড়ালাম। বললাম– 'দেখে নিও, একদিন তোমার বাবা ঠিকই চলে আসবে, তখন তাকে ধরে আনব তোমার কাছে। বাদ দাও... চলো, এখন খেলতে যাই।'

একে তো বলেছি তার বাবাকে এনে দেবো আর তারপর এখন খেলতে যাচ্ছি; বিল প্রচণ্ড খুশি। সেও আমার সাথে চলল খেলতে।

পেছনের বাগানে দুজনে মিলে ফুটবল খেলছিলাম। খেলছিলাম না বলে বলা উচিত, সে খেলছিল আর আমি তার বলটা গুছিয়ে দিচ্ছিলাম। আমি গোলকিপার। সে তার কচি পা দিয়ে ফুটবলে এক-একটা শট মারে, যেন ইংল্যান্ডের জাতীয় দলের সাবেক ক্যাপটেন ডেভিড বেকহ্যাম! বল আমার দিকে আসার পরিবর্তে একবার ডানে যাচ্ছে তো আরেকবার বামে দিকে! আর আমাকে তা এনে দিতে হচ্ছে। এইটুকুই ছিল আমাদের খেলা।

এভাবে অনেকক্ষণ খেলার পর অধৈর্য হয়ে একবার বলটায় জোরে লাথি মেরে বসলাম আর অমনি বলটা বিলের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে পেছনের আপেল গাছের ডালে আটকে গেল। খুব একটা উঁচুতে নয়; ইচ্ছে করলেই হাত বাড়িয়ে বা একটু লাফ দিয়ে বলটা নিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু কী মনে করে যেন ওকে আমার কাঁধে বসিয়ে বলটা নিতে বললাম।

সে বল নিল বটে, কিন্তু ততক্ষণে সে আরেকটা খেলা আবিষ্কার করেছে! তা হলো– কারও ঘাড়ে চেপে বসা! কিন্তু হয়ে গেল মুশকিল। কারণ, এখন তার আগ্রহ আর খেলার বলে নেই। বুঝলাম, আমার কাঁধে চড়াকে সে ভালোই উপভোগ করেছে।

এখন ঘাড়ে চড়তে পারলেই সে মহা খুশি। মাঝেমধ্যে তার নানি এসে আমাদের এই হালচাল দেখে তাকে ধমক দিয়ে কাঁধ থেকে নামতে বলতেন। আর কখনো কখনো আমাকে কৃত্রিম অনুযোগের সুরে বলতেন– 'বাছা, তুমি তো দেখছি ওকে পাগল বানিয়ে ছাড়বে! এখন আমার বাসায় কেউ এলে তাকেও সে এভাবেই জ্বালাবে। আর রাত নেই দিন নেই যখন-তখন সে বায়না ধরে, আমাকে এখনই নিচতলায় পাঠাও, জিয়ার কাছে যাব। যতই বলি, জিয়া এখন ঘরে নেই, তা সে বিশ্বাস করবে না!'

এভাবেই ছোট্ট বিলের সঙ্গে আমার চমৎকার বন্ধুত্ব(!) গড়ে উঠেছিল। আমাদের চমৎকার এই বন্ধুত্ব থেকে পারত সুখকর ও স্মৃতিময়, কিন্তু তা আর হলো কই...

২০০৪ সালের সম্ভবত জুলাই মাস। একদিন বিকেলে অফিস থেকে ফেরার সময় দেখি জিলিয়ান তার দরজায় দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন– 'জিয়া বাছা, কাল তো আমরা চলে যাচ্ছি।'

বললাম, 'চলে যাচ্ছ মানে! কোথায়?'

তিনি বললেন, 'কেন তোমাকে না বলেছিলাম, কাউন্সিলে আবেদন করেছিলাম একটি সরকারি বাড়ির জন্য, তা মঞ্জুর হয়েছে।'

মনে পড়ল, কদিন আগে তিনি সে কথা জানিয়েছিলেন। বললাম, 'তাই নাকি! কংগ্রাচুলেশন, তোমার নতুন বাড়ির জন্য।'

তিনি খুশি হলেন। আশেপাশে বিল নেই, দেখলামও না। হয়তো কোথাও খেলতে ব্যস্ত। কোনো প্রশ্ন না করে বাসায় ঢুকে পড়লাম!

পরদিন ছুটি। রাত আড়াইটায় ফজরের নামাজ শেষে এক লম্বা ঘুম দিয়েছিলাম। সকালে প্রতিদিনকার মতোই ধুমধাম শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। নাস্তা সেরে এককাপ চা বানিয়ে নিয়ে ড্রয়িংরুমে বসেছি। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি বাইরে একটা লরি দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকজন লোক তাতে আসবাবপত্র ওঠাচ্ছে। মনে পড়ে গেল, জিলিয়ানরা আজ চলে যাচ্ছে।

জামা-কাপড় পরে নিচে নেমে এলাম। ততক্ষণে আসবাবপত্র নিয়ে লরি চলে গেছে। কেবল একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। বোধ হয় জিলিয়ান আর বিলের অপেক্ষায়। ওদের কাছে যাওয়ার জন্য সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই দেখি জিলিয়ান নেমে আসছেন আর তার আগে

আগে নামছে বিল। বিল দৌড়ে এসেই আমার হাতটি ধরে বলল– 'জিয়া, আমরা তো নতুন বাসায় যাচ্ছি!'

নতুন বাসায় যাচ্ছে বলে ওর খুব আনন্দ হচ্ছে। মিসেস জিলিয়ানের হাত থেকে লাগেজ নিয়ে তাদের গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। তিনি বিলকে গাড়ির ভেতরে তুলে দিলেন। বিল জানালা ধরে বাইরে আমার দিকে তাকিয়েই থাকল। আমি আরেকটু কাছে গিয়ে তাকে বললাম– 'বিল, ডোন্ট বি নটি উইথ ইউর গ্রান্ডমা।'

মিসেস জিলিয়ান ওপাশের দরজা দিয়ে গাড়ির ভেতরে বসেছেন। বিল এক মুহূর্তও চুপ করে বসে থাকতে পারছে না। একবার সে সিটের ওপরে উঠছে তো আরেকবার নিচে নেমে জানালা দিয়ে মাথা বের করে দিচ্ছে। ওর নানি একবার তাকে ধমকও দিয়ে চুপ করে বসে থাকতে বললেন, কিন্তু কে শোনে কার কথা!

ড্রাইভার তার সিটে উঠে বসল। বিল জানালা দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আমাকেও গাড়িতে উঠতে বলল। আমি যাচ্ছি না জানালে কথার সত্যতা যাচাই করার জন্য সে তার নানির দিকে তাকাল। বিল বারবার প্রশ্ন করছে, আমি তার সাথে যাচ্ছি না কেন! কী জবাব দেবো ওকে? ইতোমধ্যেই গাড়িটা নড়েচড়ে উঠল। ড্রাইভার সাইড মিরর দিয়ে পেছনের গাড়ি দেখে নিতে ব্যস্ত। বড়ো রাস্তায় গাড়ি তুলবে সে। মিসেস জিলিয়ান আমাকে ধন্যবাদ জানালেন, শরীরের যত্ন নিতে বললেন।

মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। প্রতিবার আমার মা-ও এভাবেই আমাকে শরীরের যত্ন নিতে বলেন। গাড়ি স্টার্ট হচ্ছে। বিল জানালা দিয়ে একটি হাত বের করে দিয়েছে। আমি ওর হাত আলতো করে ছুঁয়ে দিলাম। আমাকে একটি মুহূর্তের জন্য কাছে পেয়ে বিল হঠাৎ করেই বলে ফেলল– 'জিয়া, উইল ইউ ব্রিং মাই ড্যাড ব্যাক টু মি?'

আচমকা ওর এমন প্রশ্নে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। মুখ দিয়েও যেন কথা সরছে না। ততক্ষণে গাড়ি বড়ো রাস্তায় উঠে চলা শুরু করেছে এবং ক্রমেই তা দূরে সরে যাচ্ছে। বিল জানালা দিয়ে তার মাথা আর হাত বাইরের দিকে বের করে আমারকে বাই বাই জানাচ্ছে! হয়তো তার প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায় চেয়ে আছে আমার দিকে। এখনও গাড়িটা দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যায়নি, কিন্তু আমার চোখে এ কী হলো? কেমন যেন সব ঝাপসা দেখছি! কোটের পকেটে হাত ঢোকালাম, ধুর ছাই! রুমালটাও ফেলে এসেছি।